

মনের উপনিবেশ মনের মুক্তি

মুসা আল হাফিজ



প্রকাশকের কথা

বাংলাভাষী একাডেমিশিয়ানদের নিয়ে অনেক হতাশা আছে। সত্যিকারার্থেই মৌলিক কথামালা খুব কম আসছে। প্রায় সর্বত্র এখন চিন্তার দাসত্ব; মৌলিক চিন্তার ফলন তাই খুবই কম। যে যেভাবে পারছে, দাসত্ব করে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করছে। এই উপমহাদেশের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তানও উম্মাহকে অনেক স্কলার উপহার দিচ্ছে। কিন্তু একরাশ হতাশা নিয়ে দেখবেন—বাংলাদেশে স্কলার নেই; থাকলেও সংখ্যায় উল্লেখ করার মতো নয়।

চিন্তাবক্ষ্যাত্বের মাঝেও দুই-একজন নাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক জাহাজের মাস্তুল টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। স্রোতের বিপরীতে হাঁটার ঝুঁকি ও সাহস কজনই-বা নিতে পারে? মুদ্রার দুপিঠই নয়; অদৃশ্যমান পিঠটাও দেখার মতো চোখ তো বেশি নেই। বাংলাদেশে এই সময়ের আলোচিত গবেষক, কবি ও সাহিত্যিক মুসা আল হাফিজ শত হতাশার ভিড়ে কিছুটা হলেও আশার আলো। হয়তো এই চিন্তককে নিয়ে আমার মাঝে ব্যক্তিগত ফ্যাসিনেশন আছে, তবে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি—মুসা আল হাফিজকে পাঠ করে আপনিও অভিভূত হবেন। নতুন ও মৌলিক কিছু চিন্তার সাথে পরিচিত হবেন।

‘মনের উপনিবেশ মনের মুক্তি’ গ্রন্থে লেখক আমাদের মানসিক বক্ষ্যাত্ব ও দাসত্বকে তুলে এনেছেন এবং সেসব থেকে মুক্তির ট্যানেল নির্মাণের কিছু সূচনাবিন্দুকে সামনে আনার সুপারিশ করেছেন। আত্মসন, মিথ, বৈকল্য, সংকট নিয়ে খোলামেলা আলাপ আছে এখানে। কী করে আমরা সাদাকে কালো হিসেবে মেনে নেওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় বের করছি, সে সমীকরণ এখানে মেলানো হয়েছে। পশ্চিমা বোধ ও বিশ্বাসকে ঔপনিবেশিক চাদরে মুসলিম উম্মাহকে আবৃত করে নেওয়া হয়েছে দক্ষতার সাথে। স্বাধীন চিন্তার সীমা-পরিসীমাও নির্ধারণ করে দিচ্ছে পশ্চিমা বয়ান। জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার, মুক্তি শব্দগুলোর একটা একুশ শতকীয় একান্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করা হয়েছে। কথা ছিল, এসবের মুখোশ উন্মোচন করবে স্বাধীন বুদ্ধিজীবীতা, কিন্তু কী আফসোস! বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে দেখবে, কতটুকু দেখবে—সেটাও নির্ধারণ করছে তারা, যারা মনের উপনিবেশ তৈরি করতে চায়।

এই গ্রন্থে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে লেখা। বলা যায়, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখাগুলো নিজেই লেখকের মস্তিষ্ক থেকে অক্ষরে পরিণত হয়েছে; কোনো বন্দোবস্তির চাপিয়ে দেওয়া আদেশ মেনে আসেনি। পাঠক লেখাগুলোকে সময় ধরে ধরে পড়বেন বলে প্রত্যাশা করছি। গ্রন্থটি প্রকাশে গার্ডিয়ানের প্রতি আস্থা রাখায় আমরা সম্মানিত লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমাদের তরুণরা সঠিক বোধে ফিরে আসুক, তারা সত্যকে জানুক। চিন্তাদাসত্ব থেকে মুক্ত হোক তাদের মন ও হৃদয়। মনের উপনিবেশ ভেঙে ফেলবই আমরা, ইনশাআল্লাহ। মুক্ত হোক বন্দি মন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ এপ্রিল, ২০২১

লেখকের কথা

জ্ঞানকাণ্ড ও সৃজনশীলতাকে যদি স্বাধীন না করা যায়, তাহলে কোথায় থাকে আমাদের স্বাধীনতা? কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা কোথায়, সেটা তালাশ করতে হলে আমাদের দেখার চোখকে স্বাধীন হতে হবে। সমস্যা হলো, দৃষ্টি আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। সবখানেই চলছে পশ্চিমা খবরদারি!

কিন্তু সমস্যা এটাই নয়। পশ্চিমা মস্তিষ্কশাসন থেকে মুক্তির জন্য যে আওয়াজ এখন উচ্চারিত হচ্ছে, তার স্বর ও ভঙ্গিমা স্থির করে দিচ্ছে পশ্চিমা জ্ঞানশাসন! ফলে পরিস্থিতি মুক্তিকামী মানবতার জন্য অনেক জটিল ও বিপজ্জনক।

এই জটিলতা ও বিপদের খানা ও খন্দক লুকিয়ে আছে সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, চিত্রকলায়, সমাজবিদ্যায়, রাষ্ট্রতত্ত্বে—সবখানে। এগুলোকে ধরিয়ে দিতে ব্যর্থ এর মধ্যে খাবি খেতে থাকা বুদ্ধিজীবীতা। বরং সত্য হলো, এই বুদ্ধিজীবীতা কাজ করছে ক্ষমতার চাকর হিসেবে এবং উপনিবেশের জিজির হিসেবে। আমাদের হাতে নয়; মনে সেই জিজির লাগানো হচ্ছে। বিদ্যমান জ্ঞানব্যবস্থা এবং উপনিবেশিক আধুনিকতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা সেই বন্দিত্বকে জোরদার করার পক্ষে কাজ করে চলে!

ফলত আমরা বন্দি হই এবং আরও বেশি হতে থাকি। কিন্তু গুরুতর ব্যাপার হলো—আমরা মনে করতে থাকি, আমরা আসলে মুক্ত হচ্ছি! মনে যখন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন এমনই ঘটে। মুক্তি চাওয়ার ইচ্ছেটাও জাগে না। কেন কেউ বন্দিত্ব থেকে মুক্তি চাইবে, যখন সে বন্দিত্বকে ভাবে মুক্তি?

এই যখন বাস্তবতা, তখন মুক্তির বয়ান আসলে কী? বুদ্ধিজীবীর কাজ আসলে কী? আত্মপরিচয় ও আত্মবিনির্মাণের দিশা আসলে কী? মুক্তিকামী জনতার গন্তব্য কী হবে? কী সব মূল্যমান, অভিজ্ঞান ও ঐতিহ্য নিয়ে তারা উপস্থাপন করবে নিজস্ব ডিসকোর্স? কী হবে মনের বন্দিত্বকে বিশ্লেষণের এবং মনের মুক্তিকে অবলোকনের জ্ঞানভাষ্য? ইত্যাকার নানা প্রশ্নে বাঙ্গময় এ বই।

এখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমা আধিপত্য ও ইসলাম। এই ‘দাঁড়িয়ে থাকা’র অর্থ ও তাৎপর্য কী? ইসলামের বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য কীভাবে লড়াই করে? কীভাবে বিস্তার করে ফোবিয়া ও হেইট? সেসবের স্থানীয় ও বৈশ্বিক নানা প্রকরণের প্রতি আলোকপাত রয়েছে নানাভাবে।

বইয়ে নিহিত প্রবন্ধগুলো মূলত বিভিন্ন সময়ের রচনা। সবগুলোই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে। কিন্তু শেষ অবধি সব প্রবন্ধ একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত। সেই কেন্দ্র হচ্ছে—মনের উপনিবেশ মনের মুক্তি!

চিন্তার দুনিয়ার অস্থিসন্ধিকে পুনর্পাঠ ও প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের পথে বইটি আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনে সহায়ক হতে চায়।

মুসা আল হাফিজ

২৭ মাঘ, ১৪২৭

২৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪২

১০ মার্চ, ২০২১

সূচিপত্র

উপনিবেশের নরম-গরম

◈ উপনিবেশিক মন অথবা ‘বিশ্ব আমি খাব’	১৩
◈ মুক্তবুদ্ধি : সাম্রাজ্যবাদের টার্গেট	২৩
◈ ‘আমরা’ ও ‘তারা’র বারুদ	২৯
◈ হলোকাস্ট : মিথ ও ইহুদিবাদ	৩৪
◈ শান্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বাসের সংলাপ	৪১

বুদ্ধিবৃত্তির কালো-ধলো

◈ বুদ্ধিজীবিতা : দায়িত্বশীল ‘মগজ’ কিংবা ‘বিপজ্জনক বিষ্ঠা’	৫১
◈ মানবিক পৃথিবীর সংগ্রাম : কে দাঁড়িয়ে কোন দিগন্তে!	৫৭
◈ ‘শয়তানের ডালকুত্তা’ ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিশা	৬১
◈ বাংলাদেশে গণবিরোধী বুদ্ধিজীবিতার বিকার	৬৬
◈ বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশ ও জাতির আত্মশক্তির বিকাশ	৭৪

পশ্চিমা ফোবিয়া বনাম ইসলাম

◈ ইসলামোফোবিয়া ও অপরাধ	৮১
◈ উলটানো দৃষ্টি ও অলীক ভীতি	৮৭
◈ ইসলাম প্রশ্ন : রাশিয়া ও পুশকিন	৯৩
◈ গ্যেটে ও ইসলাম প্রশ্ন	১০০
◈ সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম নেতাদের ভাষা	১০৮
◈ গ্রন্থ নিষিদ্ধকরণ : ইসলামোফোবিক বয়ানের চেহারা!	১১২

দগ্ধ সময় ও ডস্মাহ

- ◈ মুসলিম উস্মাহ এবং সময়ের দেয়াল লিখন ১২১
- ◈ আরব জাহানে কী চায় ইজরাইল ১২৮

নিরাময় হুও বাংলাদেশ

- ◈ গুণগত পরিবর্তন অপরিহার্য ১৩৫
- ◈ জাতীয় উন্নয়নের জমি ১৩৮
- ◈ ভূ-রাজনীতি ও কূটনীতি : আড়ালের অঙ্ক ১৪২
- ◈ বখতিয়ার খিলজি ও নালন্দার সত্য-মিথ্যা ১৪৭
- ◈ বাংলা নববর্ষ ও মনুবাদ ১৫৩
- ◈ আলোকায়ন, আজকের বাংলাদেশ ও ভবিষ্যতের পথ ১৫৭

ব্যক্তি ও বিভূতি

- ◈ কাজী নজরুল ইসলাম : একুশ শতকে কেন অনিবার্য ১৬৫
- ◈ ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও কবির লড়াই ১৭২
- ◈ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : পাদরির দেখা সুপারম্যান ১৭৯
- ◈ আল মাহমুদ কি মুক্তিযোদ্ধা ১৯৫
- ◈ রাহাত ইন্দুরি ও ভারতে নিপীড়িতের আওয়াজ ২০১

ঔপনিবেশিক মন অথবা ‘বিশ্ব আমি খাব’

বাকি বিশ্বের ওপর ইউরোপ বরাবরই প্রভুত্বকামী। ইউরোপের প্রভুত্বকামী মানসিকতার নমুনা প্রাচীন অতীত থেকে আজকের বাস্তবতায় জ্বলন্ত। তাদের আর্টিলারি থেকে নাট্যমঞ্চ এবং বোমা থেকে গীতিকাব্য অবধি সবকিছুতেই রয়ে গেছে এই মানসিকতার ছাপ। আধুনিক পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার মধ্যে সেটা অনেক বেশি খোলাসা হয়েছে। ইউরোপীয় আধুনিক জাগরণের সূচনাবিন্দুতে বাকি বিশ্বের প্রতি তার মনের মুখ কেমন ছিল—সেটা দেখার জন্য টরডিসিলাস চুক্তির সিদ্ধান্তের দিকে তাকাতে পারি।

বিশ্বের ওপর স্পেন ও পর্তুগালের অধিকার প্রশ্নে পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজান্ডার (১৪৩১-১৫০৩) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ১৪৯৪ সালের ৭ জুন। তিনি ইউরোপের বাইরের গোটা দুনিয়াকে বণ্টন করে দেন স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে। ইউরোপবহির্ভূত দুনিয়াকে তিনি দুই ভাগ করেন। পশ্চিম ভাগ দিলেন স্পেনকে, পূর্বভাগ পর্তুগালকে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দখল হবে, শাসন করবে স্পেন। পর্তুগাল দখল ও শাসন করবে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কা দ্বীপসমূহ। সেখানকার বন, সম্পদ, মানুষ ও প্রকৃতি, সভ্যতা-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি—সবকিছুতে তারা কর্তৃত্ব কয়েম করতে পারবে।^১

দেশ দখল ও শাসন, দাস বানানো বা শাস্তিদান, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, সম্পদ আত্মসাৎ কিংবা ব্যবহার—সবকিছুতেই তাদের অধিকার। তারা সেখানকার অসভ্যদের সভ্য বানাবে; তথা অখ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টান বানাবে। বিনিময়ে নেটিভদের জীবন ও জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে তাদের অধিকার।

সেকালে গড়পড়তা একজন পাদরিও ইউরোপীয় দুনিয়াকে কীভাবে নিজের শিকারক্ষেত্র মনে করতেন, এর নমুনা সে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি যিনি প্রদান করেন, তিনি পশ্চিমা মানসিকতার এক অনস্বীকার্য প্রতিনিধি। ১৪৩১ সালের ১ জানুয়ারি স্পেনের কিংডম অব ভ্যালেন্সিয়ায় (এরাগন রাজ্যের হাতিভাতে) তার জন্ম হয়। বালক বয়সে তার ডাকনাম ছিল রডরিগো বার্জিয়া। স্পেনের মুসলিম সভ্যতার উচ্ছেদে কিংডম অব ভ্যালেন্সিয়া লড়াই করছিল যুগ যুগ ধরে। বালক রডরিগো শুনেছেন সেই লড়াইয়ের কাড়ানাকাড়ার আওয়াজ। তার দাদা রড্রিগো গিল ডে বুর্জা ছিলেন ক্রসেডের এক প্রচারক।

তার চাচা লুইস জোয়ান অব মিলা (১৪৩২-১৫১০) ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল এবং পিতা জফ্রি লিয়াঙ্কল ই ইঙ্কিভা (১৩৯০-১৪৩৭) ছিলেন ভ্যালেন্সিয়ার প্রভাবশালী এক নেতা। তার মা ইসাবেলা ডে বুরজা ই কাভানিলেস (মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৪৬৪) ছিলেন বিখ্যাত বুরজা পরিবারের কন্যা, যে পরিবার শত শত যোদ্ধা, পাদরি, রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষক উপহার দিয়েছে খ্রিষ্টবিশ্বকে। ফলে অবধারিতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি-সচেতন।

নানা জুয়ান ডোমিঙ্গো ডে বুরজা ছিলেন যোদ্ধা। ১৩৫৭ সালে তার জন্ম হয়। তার মৃত্যু সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না। তার মামা আলফনসো ডে বারজা ওরফে ক্যালিকস্টাস-৩ (১৩৭৮-১৪৫৮) ছিলেন ক্যাথলিক পোপ। বিশপ অব রুম।^২

ইউরোপের রাজনীতি তখন মুসলিমভীতিতে জ্বরাক্রান্ত। কয়েক শতকের ধারাবাহিক ক্রুসেড পরাজয়ে পরিণত হয়েছে। ওসমানি সালতানাতের বিজয় অভিযানে জার্মানি-ইতালি ও বলকান অঞ্চল কম্পমান। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (১৪৩২-১৪৮১)-এর কনস্ট্যান্টিনোপল জয় ছিল প্রবল এক আঘাত। এরপর ১৪৫৯ সালে সার্বিয়া দখল করে নেয় ওসমানিরা। ১৪৭০ সালে আলবেনিয়া চলে যায় তুর্কি অধিকারে। ১৪৮০ সালে ওসমানি বিজয়াভিযান প্রবেশ করে ইতালিতে। অধিকার করে নেয় অন্যতম শহর ওটরান্টো। ১৪৮১ সালে মুহাম্মাদ ফাতিহর ইন্তেকালের পরে মুসলিমরা ইতালি ত্যাগ করলেও ইউরোপীয়রা প্রবলভাবে ছিল আতঙ্কিত। কখন আবার এগিয়ে আসে তুর্কিবাহিনী! আত্মরক্ষার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিল না রত্নগুলো। ইতালির পোপ দ্বিতীয় পিয়াস (১৪০৫-১৪৬৪) হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন—‘আমি তো কোথাও আর আশার কোনো আলোই দেখতে পাচ্ছি না!’ তখন ক্যাস্টাইল-ভ্যালেন্সিয়ায় ইউরোপের আশার আলো প্রজ্বলনের কাজ চলছে। ইতিহাস নিচ্ছে নতুন মোড়। আলেকজান্ডারের দাদা ও নানার পরিবার ছিল এর কেন্দ্রে।

‘মুসলিম শত্রু’ কথাটা শুনতে শুনতে পেরিয়েছে তার শৈশব, কৈশোর। জন্মদাগের মতো তার মনে গেঁথে যায় মুসলিমঘৃণা। জাতীয় শত্রু হিসেবে মুসলিমবৈরী মানসিকতার ওপর দাঁড়ায় তার খ্রিস্টীয় চেতনা। যৌবনে যখন তিনি বোলোগানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন, সেখানে জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে মুসলিম পণ্ডিতদের বই ছিল পাঠ্য। আবার সেখানে ছিল মুসলিম শত্রুদের বিরুদ্ধে জ্ঞানগত লড়াইয়ের উদ্যম। তাদের জ্ঞান দিয়ে তাদের হারিয়ে দেওয়ার প্রত্যয়। রডরিগো এ প্রত্যয়ে নিজের শৈশব-কৈশোরের পরিচিত চেতনার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। আইনবিদ্যা ছিল তার পাঠ্যবিষয়। ডক্টর অব ল উপাধি নিয়ে তিনি সেখানে পাঠ সম্পন্ন করলেন, কিন্তু এর সাথে সাথে পড়া চালিয়ে গেলেন; বিশেষত ইসলাম ও ইসলামি দুনিয়া নিয়ে।

মুসলিম ইতিহাসের বিজয় ও আধিপত্য তাকে বিস্মিত করত। রডরিগো বিশ্বাস করতেন, দুনিয়াজুড়ে দখলদারি কেবলই খ্রিষ্টানদের অধিকার। অন্যরা অন্যায়ভাবে সেটা ভোগ করছে। এ

বিশ্বাস অবশ্য তিনি লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। তার মামা বিশপ আলফনসো ডে বারজার সহায়তায় ১৪৫৬ সালে তিনি হন ভ্যালেন্সিয়ার কার্ডিনাল।^৭

ভ্যালেন্সিয়া তখন মুসলিম ম্যুরদের সাথে লড়ে চলেছে নিরন্তর। চারদিক থেকে আন্দালুসিয়ার পরিসর সীমিত করে এনেছে। আরাগনের রাজা ফার্নান্দো দ্বিতীয় (১৪৫২-১৫১৬) এবং ক্যাস্টাইলের রানি ইসাবেলা প্রথম (১৪৫১-১৫০৪) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৪৬৯ সালে। দুই রাজ্য এক হয় মূলত মুসলিম উচ্ছেদের জন্য। মুসলিমদের চূড়ান্ত পতন সময়ের ব্যাপার হয়ে উঠল। এতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি ধর্মীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত জরুরি। সে ভূমিকা সর্বাত্মকভাবে রাখছিলেন আলেকজান্ডার।

রাজা ও রানির সহযোগিতায় তার উদ্যম ও প্রচেষ্টা ছিল প্রভাবশালী। তাদেরই হাতে ১৪৯২ সালের ২রা জানুয়ারি স্পেনে চূড়ান্ত অবসান ঘটে ৭৮১ বছরের মুসলিম শাসনের।^৮ অতঃপর আলেকজান্ডারের পরিসর হয় আরও প্রসারিত। ১৪৯২ সালের ১১ আগস্ট তিনি নির্বাচিত হলেন খ্রিষ্টান দুনিয়ার পোপ। ১৯৯৪ সালে আলেকজান্ডার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাথলিক কিং এবং কুইন উপাধি প্রদান করেন বিজয়ী রাজা-রানিকে।

স্পেন তখন নৌ-আধিপত্যে প্রতিযোগিতা করছিল পর্তুগালের সাথে। পোপ চাইলেন উভয়ের দ্বন্দ্বের বদলে ঐক্য। দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য দুনিয়াকে করে দিলেন ভাগ-বাটোয়ারা।

খ্রিষ্টীয় দুনিয়ায় ঐক্যের অভিপ্রায় তিনি ছড়াচ্ছিলেন নানাভাবে। এরই প্রভাব পড়েছিল নানা ক্ষেত্রে। ১৫০৯ সালে ফার্ডিনান্দ ও ইসাবেলার কন্যা কাতেরিনার (১৪৮৫-১৫৩৬) বিয়ে হয় ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির (১৪৯১-১৫৪৭) সাথে। ১৫১২ সালে রাজা ফার্ডিনান্দ নাভার রাজ্য দখল করেন এবং এর মাধ্যমে বিভক্ত স্পেনের একত্রীকরণ সম্পূর্ণ করেন। দুনিয়াজুড়ে দখলদারি বিস্তারে স্পেন এগিয়ে চলল দ্রুতই। অচিরেই গোটা ইউরোপ মেনে নেয় তার শ্রেষ্ঠত্ব। রাজা প্রথম কার্লোস ১৫১৯ (মেয়াদকাল : ১৫১৬-১৫৫৬) সালে লাভ করেন পবিত্র রোমান সম্রাটের উপাধি। এর ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্সের বিশাল অংশ এবং ইতালির একাংশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসে তার হাতে।

হলোকাস্ট : মিথ ও ইহুদিবাদ

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে হলোকাস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ। এমন এক বিষয়, যার ওপর পা রেখে অস্তিত্বে এসেছে একটি রাষ্ট্র। ইজরাইল; ইহুদিবাদী উপনিবেশ! ঐতিহাসিক রবার্ট বি গোল্ডম্যান লিখেছেন—‘হলোকাস্ট ছাড়া ইজরাইল নামক রাষ্ট্র গঠন সম্ভবই ছিল না।’ গোল্ডম্যানের কথাটি যেভাবে ঐতিহাসিক, তেমনি ধর্মতাত্ত্বিক। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে আছে হলোকাস্টের ধারণা। তালমুদের ভাষ্য হচ্ছে—ইহুদিরা যখন রাজ্যহারা হয়ে যাবে, তখন ৬০ লাখ ইহুদিকে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র!

নিজেদের একটা রাষ্ট্রের জন্য ৬০ লাখ প্রাণ দান ইহুদিদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি; যদিও তাদের প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্র অর্জন। কেননা, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ দেশে দেশে তারা উদ্বাস্তুরূপে উৎপীড়নের শিকার হয়ে জীবনযাপন করছিল। হিটলারের নাৎসিজম যখন জার্মানিতে উসকে উঠল, তখন সেখানকার ইহুদিদের পিঠটা একেবারে দেয়ালে ঠেকে যায়। পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে যেকোনো জাতির জন্যই একটা না একটা প্রতিবিধান হয়ে যায়। এটা অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মেই। ইহুদিদের জন্যও হলো। উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে দিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

তারা তখন চাইল, হলোকাস্টের কর্তব্যটার একটা রাহা করা যায় কি না। হলোকাস্ট কথাটার সরল তর্জমা হলো আত্মবিসর্জন বা কুরবানি। আগেকার রোমান ও গ্রিকদের ধর্মীয় রীতিতে দেবতাদের খুশি রাখতে অন্ধকার রাতে কালো রঙের পশুকে পুরোটা ঝলসিয়ে উপটোকন হিসেবে পাহাড়ে রেখে আসা হতো। এটাকে তারা বলত—Holokaustos। শব্দটি গঠিত গ্রিক শব্দ Holos (Whole) ও Kaustos (Burnt) একসঙ্গে মিলে। এর মানে হলো—পুরোপুরি ঝলসানো উপটোকন।

পরে ইংরেজিতে সেটা Holocaust হয়েছে। ইহুদিদের কাছে এ ছিল খুবই গুরুতর এক কাজ—যেখানে পশু নয়; হলোকাস্ট করতে হবে নিজেদের ৬০ লাখ প্রাণ! যে প্রাণদানে তাদের অনীহা ইতিহাসস্বীকৃত।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদি মিডিয়া প্রচার করল, হলোকাস্ট সংগঠিত হয়ে গেছে। ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা করেছে হিটলার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্টালিন (যিনি নিজে একজন ইহুদি ছিলেন) ঘোষণা দিলেন—নাৎসিরা বিভিন্ন শ্রমশিবিরে ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা করেছে। হিটলারের বিরুদ্ধে বিশ্বকে ক্ষেপিয়ে তোলার মোক্ষম একটি হাতিয়ার হিসেবে এটাকে লুফে নিল মিত্রজোট। ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রচারে যোগ দিলো। ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেল গোটা বিশ্বে। তারপর বিশ্বযুদ্ধ

একসময় শেষ হবে। হলোকাস্টের জন্য জার্মানিকে দায়ী করে ইহুদিদের জন্য ৬ হাজার ৮শ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

যার ওপর ভর করে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদিরা রাষ্ট্র গঠন করবে। হলোকাস্ট রোধে ব্যর্থতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইহুদি রাষ্ট্রের অভিভাবক হয়ে যাবে। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধপরবর্তী কয়েক দশকে ইহুদিদের তিন লাখ কোটি ডলার অর্থসাহায্য প্রদান করবে। হলোকাস্ট হয়ে উঠবে বিশ্বরাজনীতির বাঁক বদলে বিশেষ প্রভাবক।

এর ফলে বিশ্ব পরিস্থিতিতে কর্তৃত্বের লাগামটা ধীরে ধীরে ইহুদিবাদের অনুকূলে চলে যাবে। কেউ যদি এই ঘটনাকে সন্দেহ করে, তাহলে তাকে হিটলারের দালাল আখ্যায়িত করা হবে। একে যাতে কেউ অস্বীকার করতে না পারে, সেজন্য ইউরোপের দেশে দেশে কার্যকর হবে নতুন আইন। ‘ল’ এগেইনেস্ট ডিনায়াল অব হলোকাস্ট নামের এ আইনে একে অস্বীকার বা লঘু করার চেষ্টাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে নিশ্চিত করা হবে। এর জন্য শাস্তি হিসেবে ৬ বছর কারাদণ্ড এবং ৭ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখবে কিছু দেশ। সন্দেহকারী কারও কারও ওপর ইহুদি জঙ্গিবাদীরা হামলা করবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদকে সন্দেহ পোষণের কারণে হাভার্ড ইউনিভার্সিটিতে সামনাসামনি মূর্খ বলে আখ্যায়িত করা হবে। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের মাথার ওপর ঝুলতে থাকবে অপবাদ, একঘরে হওয়ার ভীতি; এমনকী মৃত্যু আশঙ্কার খড়গ।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি হলোকাস্ট ঘটেছিল? ৬০ লাখ ইহুদি নিহত হয়েছিল? হলোকাস্টের প্রবক্তারা শুধু ইহুদিদের মৃত্যুর কথা বলেই ক্ষান্ত নন; বরং তারা বলেন যে, জার্মানরা ইহুদিদের হত্যা করে মৃতদেহ দিয়ে সুপ তৈরি করেছিল। পোল্যান্ডের অসউইচ শ্রমশিবিরে ৪০ লাখ ইহুদিকে গ্যাসচেম্বারে হত্যা করা হয়েছিল। বুচেনওয়াল্ড, বারজেন বেলসেন, মাউখাউসেন, ডাকাউ এবং জার্মানির মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য বন্দিশিবিরে হত্যা করা হয়েছিল ২০ লাখ ইহুদি। ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক। এটা যদি আংশিকও সত্য হয়, তাহলেও তা অবশ্যই মর্মান্তিক। কিন্তু ইহুদিদের দেহ দিয়ে সুপ তৈরির বিষয়টিকে ইহুদি ইতিহাসবিদ মিথ্যা ও গুজব সাব্যস্ত করেছেন। আর যে অসউইচে ৪০ লাখ ইহুদি হত্যার কথা জোর দিয়ে বলা হয়—এ সম্পর্কে অসউইচ বারকেনিউ জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর ও রাষ্ট্রীয় মুহাফিজখানার পরিচালক ড. ফ্রান্সিসজেক পাইপারের মন্তব্য হলো—‘এটা একটা ডাहा প্রতারণা।’

ভূ-রাজনীতি ও কূটনীতি : আড়ালের অঙ্ক

ড. তাহের মঞ্জুর আমার ভালো বন্ধু। উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা ও কারিকুলাম নিয়ে তিনি পিএইচডি করেন। ২০১৫ সালে সিলেবাস ও কারিকুলামবিষয়ক একটি উদ্যোগে কয়েক দিন আমাদের কাজ করতে হয় একসঙ্গে। উদ্যোক্তা ছিলেন বিটিভি সাংবাদিক ফোরামের সাবেক সভাপতি, প্রবীণ লেখক মুহাম্মাদ ফয়জুর রহমান। তাহের মঞ্জুর প্রায়ই গল্প করতেন তার এক পুত্রের কথা। মেধাবী। সম্ভবত ফোর বা ফাইভে পড়ত।

বালকটি বিশ্বের বড়ো বড়ো ঘটনা নিয়ে আগ্রহী, বড়ো বড়ো নেতাদের নিয়ে আগ্রহী। সে বলত—‘এই যে সামান্য এক কালো মেয়ে কন্ডোলিজা রাইস, তার কথায় দুনিয়ার বাঘা বাঘা নেতারা কেঁপে উঠবে কেন? সে তো আর খুব গর্জন করে বলে না, আস্তেই কথা বলে। কিন্তু সে যখন কথা বলে, তার পেছনে থাকে অগণিত ফাইটার, কার্পেট বোমা, পারমাণবিক অস্ত্র। ফলে এই পেছনের শক্তিটির কারণে সামান্য কন্ডোলিসা রাইস বিভিন্ন দেশের কান মলে দেয়। সে যা বলে, সবাইকে শুনতে হয়, মানতে হয়।’

বালকটি বলত—‘আমি বড়ো হয়ে আমার দেশকে এমনই শক্তিশালী করব। তখন কালো, ছোটোখাটো কোনো মেয়েও যদি আমার দেশের পক্ষ থেকে কথা বলে, সবাই মন দিয়ে শুনবে, মানবে। কেউ পান্ডা না দিয়ে পারবে না।’

বালকটির কাহিনি এখানেই শেষ। তার উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবের গোড়ায় মূল শক্তিটি সে যে সরলতায় ধরতে পেরেছে, তা কি সেভাবে পারছে দুর্বল দেশের দুর্বল শাসকরা?

শক্তিহীনের আবদার, অনুযোগ বিশ্বরাজনীতিতে মূল্যহীন। আপনি গুরুত্ব কামনা করলে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। সেই ক্ষমতা হচ্ছে অন্যের জন্য ভীতিকর, অপ্রতিহত সামরিক সামর্থ্য, যা ছেলেটি ধরেছে এবং যা অচিরেই ধরতে পারবে, তা হচ্ছে—অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সক্ষমতা।

অর্থনীতিতে পরনির্ভরশীল, সামরিক সামর্থ্যে দুর্বল, এমন রাষ্ট্র গর্জন করে বললেও তার গুরুত্ব নেই। চিৎকারে আকাশ মাথায় তুললেও তা পান্ডা পাবে না।

এমন রাষ্ট্র গরিবের বউ। সবার ভাবি। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো এদের নিয়ে খেলে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এদের ব্যবহার করে। তাদের থাকে না স্বতন্ত্র কোনো পররাষ্ট্রনীতি, বৈশ্বিক ভিউ। তারা নিজেরা নিজেদের শাসন করতে পারে না, নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে না। নিজেদের রাজনীতিকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলত তাদের দেশ হয়ে রয় অস্থিতিশীল। জাতিয় জীবনে ঐক্য থাকে অনুপস্থিত।

কিন্তু দুর্বল রাষ্ট্রও অনেক সময় অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজের জনগণের আদর্শিক ও জাতীয়তাভিত্তিক ঐক্য রচনা করে। বিশ্ববাস্তবতার আবহাওয়া বুঝে নিজের স্বার্থ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন অক্ষের সাথে যৌথতা রচনা করে। অপরকে কিছু সুবিধা দিয়ে নিজের সুবিধা নিশ্চিত করে। অপরকে শক্তি জুগিয়ে নিজের শক্তি নিশ্চিত করে নেয়। অপরের জন্য দরজা খুলে নিজেকে করে নেয় সমৃদ্ধ। এর ভালো উদাহরণ ভারত ও মিয়ানমার।

ভারত গুরুত্বপূর্ণ হতে পেরেছে বৃহৎ বাজার ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শত-কোটি মানুষ যেখানে ভোক্তা, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হামলে পড়বে, বৃহৎ শক্তিগুলো সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রতিযোগিতা করবে উৎপাদনের দৌড়ে। ভারত সেজন্য দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে যেটা করেছে, সেটা হলো—নিজের স্বার্থকে নিশ্চিত করেই। ফলে অন্যেরা লাভবান হয়েছে ভারত থেকে, কিন্তু ভারতের লাভ হয়েছে তার চেয়েও বেশি। তার অর্থনীতি বৃহৎ আকার নিয়েছে। স্থানীয় উৎপাদন বেড়েছে। বেকারত্ব কমেছে, জনগণের আয়ক্ষমতা বেড়েছে, দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠেছে। অপরদিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ তার সাথে জড়িয়ে পড়ায় তারা তাকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে, দিচ্ছে। আপন প্রয়োজনে।

তারা নিজেদের দরজাকেও খুলে দিয়েছে ভারতের জন্য। ফলে সে যা উৎপাদন করতে পারে, তাকে বিশ্বের বাজারে নিয়ে যেতে পেরেছে সুবিধাজনক জায়গায়। নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করেছে। নিজের উৎপাদনের বৈশ্বিক মান নিশ্চিত করার দায়ে স্থানীয় শিল্পায়নকে উন্নত টেকসই করেছে।

নিজের শ্রমিকদের বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের যেমন, তেমনই দক্ষদের। শত কোটির অধিক জন-অধ্যুষিত যে দেশ, সেখানে এমনিতেই দক্ষ শ্রমিকের বিপুল মজুদ থাকবে। তবুও ভারত বিভিন্ন সেক্টরকে টার্গেট করে বিশ্বময় জনবল সরবরাহে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে আইটি সেক্টরকে যথার্থই গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যান্য দেশকে সে আপন জনশক্তি ও পণ্যের বাজার বানিয়েছে, যেমন—সে হয়েছে অন্যদের বাজার। দেশে তৈরি করেছে উৎপাদনক্ষম একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। বিশাল এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সৃষ্টি হয়েছে উন্নয়নের ধারাক্রম। সেই ধারা নিশ্চিত রাখার জন্য অপরিহার্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা—তা সে নিশ্চিত করতে পেরেছে। সেটা পারেনি বলে পাকিস্তান পড়েছে অনেক পেছনে। এমনকী বাংলাদেশেরও পেছনে চলে গেছে কিছু ক্ষেত্রে। স্থিতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতি ছাড়া অর্থনীতিতে তার ঘুরে দাঁড়ানো সুদূর পরাহত।

ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আগেও। কিন্তু কোল্ডওয়ারের অবসান ও চীনের মাথা তোলার পরিপ্রেক্ষিতে সে পাশ্চাত্যের কাছে আদর পেতে থাকে বেশি। সভ্যতার সংঘাতকালীন প্রেক্ষাপটে সে আলাদা গুরুত্ব পায় হান্টিংটনের তাবিজে। আমেরিকা নতুন বিশ্বভিউ খাড়া করলে সেখানে চীনের মোকাবিলায় ভারতকে স্থানীয় লাঠিয়াল হিসেবে ভাবতে থাকে এবং সভ্যতার সংঘাতে মুসলিমপ্রধান বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অবস্থানে সে মুসলিম স্বার্থকে যদি আঘাত করে, তাদের উত্থানকে যদি দমিয়ে রাখে, সেটা তো সোনায়ে সোহাগা। অতএব, তাকে শক্তির সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

ইউরোপ-আমেরিকা অব্যাহতভাবে তাকে সুবিধা ও ছাড় দিতে থাকে। বিশ্বমিডিয়ায় সে পেতে থাকে আলাদা গুরুত্ব ও আনুকূল্য। সামরিক সামর্থ্যে তাকে আরও পরিণত করা হয়, বলিষ্ঠ করা হয়। আঞ্চলিক পাহারাদারিতে তার ভূমিকাকে মেনে নেওয়া হয়। তার স্বার্থকে সমীহ করা হয়। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাওয়া দিয়ে পারাশক্তিসুলভ আবহ এনে দেওয়া হয়। ফলত ভারত চীনকে এবং অত্র এলাকায় ইসলামি উত্থানকে মোকাবিলায় আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করেছে। অতএব, আমেরিকা ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে অত্র অঞ্চলে—এমনটাই স্বাভাবিক; সে বে-আইনি আচরণ করলেও, মানবাধিকার লঙ্ঘন করলেও।

রাহাত ইন্দুরি ও ভারতে নিপীড়িতের আওয়াজ

পাবলো নেরুদার কথাই ধরুন। আপন সময়ের প্রতিটি গুরুত্ববহ ঘটনাকে কবিতায় স্পন্দিত করে তিনি সময়ের গণমনের ইতিহাসকে নিজের মতো করে বিবৃত করেছেন। সোভিয়েত বিপ্লব, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, নার্সিবাদের উত্থান, স্টালিনবাদের রূপ ও ধরন, বিশ্বযুদ্ধ ও বীভৎসতা, ঠান্ডাযুদ্ধ ও পরাশক্তির ক্ষমতানেশা, ভিয়েতনাম, কিউবা, লাতিন আমেরিকার রক্তপাত ও নবজাগৃতি তার কবিতায় চিত্ররূপ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের নিত্যকার দিনলিপি উঠে এসেছে তার পঙ্ক্তিমালায়।

সাম্প্রতিক ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক সংকট এবং গণমনের দুঃখ, বেদনা ক্ষোভ ও আবেগের ভাষাদানে রাহাত ইন্দুরিকে তুলনা করা যায় নেরুদার সাথে। জাতীয় জীবনে প্রতিটি গুরুত্ববহ ঘটনা ও এর ফলাফল ইন্দুরির কবিতায় তীব্রভাবে প্রকটিত হচ্ছিল। নরেন্দ্র মোদি ও সংঘপরিবারের চরম হিন্দুত্ববাদী অভিপ্রায়সমূহের জবাবি বয়ান ইন্দুরির কবিতায় বিঘোষিত হতো। ফলে তার কবিতামাত্রই হয়ে উঠত ভারতের কোটি মানুষের অভিপ্রায়ের প্রতিবেদন। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিষ্টান—সকলেই তার উচ্চারণে শুনতে পেত নিজের ব্যথা, বঞ্চনা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। ক্ষমতাসীন বিজেপি ও মনুবাদী শক্তি বিরক্ত, বিব্রত ও বিম্বুদ্ধ হয়ে চোখ লাল করে প্রশ্ন করত, কোন অপশক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে রাহাতের কণ্ঠে?

ইন্দুরির কবিতা জবাব দিত—‘আমার কণ্ঠে মূলত পরওয়ারদিগার কথা বলছেন।’ তারা তাকে শেখাতে এবং বলাতে চেয়েছে তাদের ‘সত্য।’ রাহাত বলেছেন না, ‘হামারে মুহ সে যো নিকলে ওহি সাদাকাত হায়—আমাদের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হচ্ছে, সত্য সেটাই।’ ‘হামারে মুহ মে তুমহারি জবান থুড়ি হে—আমাদের কণ্ঠে তোমাদের ভাষা উচ্চারণের অবকাশ নেই।’ রাহাত এই নিজস্ব সত্য ও ভাষার উচ্চারণে ছিলেন অকুণ্ঠ। এজন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। ঘোষণা করেছেন—‘অতঃপর আমার জিহ্বা কাটতে চাইলে কেটে ফেলো। আমার যা বলার, প্রবল নিনাদেই বলব।’

কবিতা যখন গণস্তর থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, রাহাতের পঙ্ক্তিমালা তখন প্রবাদের তীব্রতা নিয়ে জনপ্রিয় হয়। জাতীয় সংসদ থেকে নিয়ে গ্রামের হাট-বাজারে কিংবা খেলার মাঠে বালকের কণ্ঠেও উচ্চারিত হচ্ছিল তার শিখায়িত বহু চরণ। রাহাত প্রতিবাদী ভারতকে জুগিয়ে গেছেন লড়াইয়ের ভাষা, স্লোগানের আগুন, আত্মপরিচয়ের সোচ্চারতা, বিদ্রোহের বিষ এবং স্বেচ্ছাচারের চোখে চোখে রেখে ‘তুই স্বেচ্ছাচার’ বলার স্পর্ধা।

হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প যে ভারতীয়দের ‘রাজনৈতিক মৃত’ অবস্থায় দেখতে চায়, তারা রাহাতের কণ্ঠে
কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করছে—

‘ওহ মুজকো মুরদা সমজ রয়ে হে
উসকো কাহ দো ময় মরা নেহি হে।’

‘ওরা ভাবছে, আমাদের মেরে ফেলেছে, আমরা লাশ,
তাদের জানিয়ে দাও, আমরা জীবিত আছি।’

এই সব মানুষ দেখেছেন, হিংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িকতা তাদের মাথার ওপর খড়গ নিয়ে হাজির।
চারদিক থেকে তৈরি করেছে ভীতিকর পরিবেশ। রাহাতের কবিতায় তারা পান এ পরিস্থিতিতে
নিজেদের প্রত্যয়ের প্রকাশ। তারা রাহাতকে উচ্চারণ করে বলেন—

‘ওহ গরদন নাপতাহে নাপ লে
মগর জালিম সে ডর জানে কো নেহি।’

‘ওরা আমাদের গর্দান মাপছে জবাই করতে বা রশিতে লটকাতে
মাপুক, কিন্তু অত্যাচারীদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
